নতুন ধারার দৈনিক
আমাদের সময়

বঙ্গবন্ধু, স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক মুক্তি

প্রকাশ | ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬, ০০:০০ | আপডেট: ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬, ০১:১৩

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

ধারাবাহিক বিশেষ কলাম

মহান মুক্তিযুদ্ধ ও রক্তস্নাত স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্ভাবনী ও সম্মোহনী নেতৃত্বে এসব বিষয়ে যে রূপরেখা তিনি দিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে দেশবাসীর আগ্রহের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই।

নদীবিধৌত টুঙ্গিপাড়া গ্রামের শেখ মুজিবের বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠা, জাতির স্থপতি এবং বাঙালি জাতির পিতা হওয়ার ঘটনাপ্রবাহ খুবই উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, তিনি ছেলেবেলা থেকেই দুর্দান্ত ছিলেন। তবে মানুষের সেবায়, দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেন। সাহসের তার কমতি ছিল না, স্কুলে পড়ার সময়ই রাজনৈতিক আন্দোলন করেছেন। খুব অসাম্প্রদায়িক ছিলেন, আবার মুসলিমদের ওপর কোনো অন্যায় হলে তা প্রতিবিধানের যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। নীতির বিষয়ে কোনো আপস কোনো সময় করেননি। এখানে একটি বিষয় বলা দরকার, শেখ মুজিব কখনই তার কোনো রাজনৈতিক মতবিরোধকে ব্যক্তিগত শত্রুতায় পরিণত করেননি। সে জন্য আমরা দেখি, যারা রাজনৈতিকভাবে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন যেমন- ইউসুফ আলী চৌধুরী মোহন মিয়া, ওয়াহিদুজ্জামান ঠা-া মিয়া কিংবা খন্দকার মাহবুবউদ্দিন আহমদ প্রমুখ তাদের বা তাদের পরিবার সম্পর্কে কথাবার্তা যখনই বলেছেন তখন ভদ্রতা সহকারে, সংযত হয়ে এবং অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শীভাবে উক্তি করেছেন। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীনকালে অনেক রাজনৈতিক বিরুদ্ধবাদীর পরিবারকে রাজকোষ থেকে অর্থ সাহায্য পাঠাতেন।

বাঙালি জাতির ইতিহাস খুব ঘটনাবহুল। তবে একটি বিষয় খুব সত্যি, মুঘল-পাঠান শাসন, সেন বংশীয় শাসন, একশ নব্বই বছরের ব্রিটিশ শাসন এবং তেইশ বছরের পাকিস্তানি আমলে সব সময় পূর্ববাংলার বাঙালিরা মোটামুটি শোষিত হয়েছে, বঞ্চিত হয়েছে, তাদের অধিকার ক্ষুণœ হয়েছে। পূর্ববাংলাকে পশ্চাদভূমি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এটা শেখ মুজিব ছেলেবেলা থেকেই বুঝতে পারতেন। তিনি শেরেবাংলা একে ফজলুল হকের সংস্পর্শে আসেন, তাদের মধ্যে অত্যন্ত স্নেহ, মমতা, শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল। আর হোসেন সোহরাওয়ার্দীর কাছে শেখ মুজিব নিয়েছিলেন রাজনীতির দীক্ষা। এ ছাড়া তিনি মানুষের কল্যাণ, সাম্রাজ্যবাদ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিষয়েও যথেষ্ট গবেষণা, চিন্তাভাবনা করেছেন। চিন দেশ ভ্রমণ করেছিলেন পঞ্চাশের দশকে। সেখানকার অনেক কিছু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। সবকিছু মিলিয়ে বিশেষ করে পাকিস্তান আমলের তেইশ বছরে বাঙালির ন্যায্য হিস্যা যে পাওয়া যায়নি সেটা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছিলেন। এর প্রতিবিধানকে মোটামুটি তার মূল রাজনৈতিক প্রতিপাদ্য হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন।

পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে খুব বন্যা হতো। চুয়ান্ন সালে হয়েছে, পঞ্চান্ন সালেও হয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে ১৯৫৬ সালে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ নিয়ে গঠিত ক্রুগ মিশন আনা হয়। ওই মিশন দীর্ঘদিন কাজ করে দুটো সুপারিশ করে। নদীশাসন করা দরকার এবং পূর্ববাংলার সব নদীকে ড্রেজিং করা দরকার। ড্রেজিংয়ের জন্য প্রকল্পের মোট খরচ ছিল ৫০০ কোটি টাকা। পূর্ব পাকিস্তান থেকে অনুরোধ করা হয়েছিল, এই টাকাটা যেন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাইরে বরাদ্দ করা হয়। পাকিস্তানিরা তা মানলেন না। এর বদলে তারা নিলেন টারবেলা ডেম প্রকল্প; এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে পাঞ্জাব এবং সীমান্ত প্রদেশের জন্য। এই প্রকল্পের ব্যয় ছিল ৬০০ কোটি টাকা। এটা ঠিকই তারা পরিকল্পনা বাজেটের বাইরে থেকে দিলেন। বন্যা নিয়ন্ত্রণের এই প্রকল্পের প্রয়োজন সব সময় অনুভূত হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের টাকা ছিল না বলে এতদিন এ প্রকল্প হাতে নেওয়া সম্ভব হয়নি। সম্প্রতি একনেকে এই প্রকল্পটি পাস হয়েছে : বাংলাদেশের সব নদীকে ড্রেজিং করা হবে। এর উপকারিতা অনেক। ১৯৫৬ সালে করা হলে বাংলাদেশের চেহারা অন্যরকম হতো। যাহোক শেখ মুজিব ভাবতেন কেন ছাপ্পান্ন ভাগ মানুষের ভাষা বাংলা হলেও তা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নয়। এমনকি স্বর্গত শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ছাপ্পান্ন ভাগ মানুষের ভাষাকে জাতীয় গণপরিষদের কার্যপ্রণালির মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করার দাবি তুলেছিলেন। সে প্রস্তাব কিন্তু পাস করা হয়নি। এসব কিছু মিলিয়ে শেখ মুজিবের রাজনীতি, জনগণভাবনা ও দেশপ্রেম।

শেখ মুজিব খুব দৃঢ়ভাবে গণতন্ত্রমনা ছিলেন। তিনি সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাস করতেন না বলেই আমার ধারণা। আটান্ন সালে যে সময়ে সামরিক আইন হয় ঠিক সে সময়ে সারা পাকিস্তানে একটা সাধারণ নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল এবং নির্বাচন হলে বাঙালি জনগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় আমাদের আইনসঙ্গত ও সংবিধানসম্মত দাবি প্রতিষ্ঠিত হবে বলে মনে করা হয়েছিল। তার বদলে সামরিক শাসন হলো। শেখ মুজিব জেলে গেলেন। আরও অনেকে জেলে গেলেন। বাঙালির ওপর জুলুম হলো। এতে পরিষ্কার বোঝা গেল, দাবি আদায়ের জন্য শান্তিপূর্ণ আন্দোলনই হবে, কিন্তু জোরদার একতাবদ্ধ আন্দোলন প্রয়োজন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে দু-তিনটা ঘটনা ঘটে। বাষট্টি সালে শিক্ষা আন্দোলন হয়। এর পর ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধটা অনেকের চোখ খুলে দেয়। যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তান সম্পূর্ণ অরক্ষিত ছিল। শেখ মুজিব আরও বাস্তববাদী হন এবং সব চিন্তাভাবনা করে রাজনৈতিক আন্দোলন অব্যাহত রাখেন।

এ ক্ষেত্রে দুটো বিষয় উল্লেখযোগ্য। এক. ১৯৬২ সালে নিউক্লিয়াস নামে একটা আধা-গোপন সংগঠন তৈরি হয়। সে ছায়াতলে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ছাড়াও প্রগতিশীল অনেক লোক জমা হন। সে সম্পর্কে অবশ্য দু'রকম মত আছে। শেখ মুজিব এটাকে মনেপ্রাণে সমর্থন দিয়েছিলেন নাকি শুধু আশীর্বাদ দিয়েছিলেন। তবে তার যে সমর্থন ছিল সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। কাজেই তিনি স্বাধীনতা চাননি এটা বলা মোটেও ঠিক হবে না। ওই নিউক্লিয়াসের মাধ্যমে স্বাধীনতার একটা পথ খোলা রাখা হয়েছিল। আর ১৯৬৬ সালের একটা নজির তো আছেই। খোদ পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোরে বসে যে ছয় দফা ঘোষণা করেছিলেন শেখ মুজিব সেটা অবশ্যই বাঙালির মুক্তিসনদ। সেখানে যেসব দাবি আছে তাতে পূর্ব পাকিস্তানের যে পর্যায়ের স্বায়ত্তশাসন হবে সেটা আদতে স্বাধীনতারই নামান্তর। এটা পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই এর পর জুলুম-অত্যাচার আরও বেড়ে যায়। শেখ মুজিবকে বারবার কারাগারে অন্তরীণ রাখা হয়। তিনি বঙ্গবন্ধু হওয়ার প্রেক্ষিতটা তৈরি হয়েছিল এসব কারণে। এর পর আগরতলা মামলা হয়। এটাকে ষড়যন্ত্র মামলা বলা হয়। কিন্তু ঘটনা খুব মিথ্যা ছিল বলে মনে হয় না। কারণ তিনি অবশ্যই বিভিন্ন ধরনের লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন, তার কাছে অনেকে আসতেন। যারা সেনাবাহিনীতে কাজ করতেন বা অবসর নিয়েছিলেন তাদের অনেকেই আসতেন। পরামর্শ করতেন এবং তিনি সব সময় বলতেন যে, হ্যাঁ, আমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে সংসদীয় পন্থায় আন্দোলন করব, কিন্তু বিকল্প পথ খোলা রাখতে হবে। এ জন্য কিছু গোপন সভা-সমিতি হয়েছিল। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা হলো। ওই মামলায় প্রথমদিকে শেখ মুজিবকে আসামি করা না হলেও পরে তার নাম সংযুক্ত করা হয়। মামলা তুঙ্গে ওঠে ১৯৬৯ সালে। শুরু হয় ঘটনা তরঙ্গপ্রবাহ।

আইয়ুব খানের পতন হলো। ইয়াহিয়া খান আসি আসি করছেন। তখন এ দেশের ছাত্র-জনতা বিশেষ করে ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগের নেতৃত্বে দশ দল এগারো দফার ডাক দেয়, খুব দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তোলে এবং শেখ মুজিবের মুক্তির জন্য প্রচ-ভাবে উত্তাল হয় দেশ। আইয়ুব খান রাওয়ালপি-িতে একটি সর্বদলীয় গোলটেবিল বৈঠক ডাকেন। সেখানে শেখ মুজিব প্যারোলে যাবেন কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন নেতা তাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, 'প্যারোলে যান' তার পর সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু প্যারোলে যেতে রাজি হননি। সেখানে তিনি বড় সমর্থন পেয়েছিলেন বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের কাছ থেকে। তিনি জেলগেটে দেখা করে বলেছিলেন, 'দেশ যেভাবে প্রস্তুত তাতে তোমার প্যারোলে যাওয়ার গ্লানি সওয়ার প্রয়োজন নেই, তোমাকে এমনিতেই মুক্তি দিতে বাধ্য হবে।' কিন্তু আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার যখন শুনানি চলছে তখন ছাত্র-জনতার আন্দোলন এত গভীরতা পায়, এত প্রবল রূপ ধারণ করে যে তার চাপে শেখ মুজিবকে জেল থেকে ছাড়তে বাধ্য হয় পাকিস্তান সরকার। এরই মধ্যে ফেব্রুয়ারি মাসে তখনকার দশ ছাত্র সংগঠনের নেতা ডাকসুর সহসভাপতি তোফায়েল আহমেদের নেতৃত্বে পল্টনে বিশাল জনসমুদ্রে অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতভাবে তাকে বঙ্গবন্ধু উপাধি দেওয়া হয়। সত্যি কথা বলতে কী, গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতার আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে একটা স্বাভাবিক গতিতে চলে আসে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের যে বিশালতা, নির্ভীকতা এবং পরার্থপরতা সব মিলিয়ে তার প্রতি একটা বিশ্বাসযোগ্যতা খুব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় সর্বমহলে।

আগেই বলা হয়েছে, রাজনৈতিক মতবিরোধ থাকলেও সেটা নিয়ে কোনো বৈরিতা তৈরি করতেন না বঙ্গবন্ধু। ছয় দফা খসড়া কে তৈরি করেছিলেনÑ এ নিয়ে মজাদার বিতর্ক আছে। কেউ বলেন অমুক অধ্যাপক করেছেন, কেউ বলেন অমুক সিভিল সার্ভেন্ট করে দিয়েছেন। আবার বামপন্থী নেতাদের মধ্যে তোয়াহা বলেছিলেন, এটা সিআইএ তৈরি করে দিয়েছে। এসব প্রেক্ষিত বঙ্গবন্ধু একেবারে প্রত্যক্ষভাবে খোলাসা করেছেন। মাঝে মাঝেই তার মাথায় জনকল্যাণ রাজনীতি চিন্তা কিলবিল করে উঠত। তিনি মনে করেছিলেন, স্বায়ত্তশাসনটাকে আরও কঠিনভাবে, দৃঢ়ভাবে রূপরেখা দিলে কেমন হয়। বলা বাহুল্য, মাসিক পাঁচ হাজার টাকা বেতনে আলফা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে

তিনি দীর্ঘদিন চাকরি করেছেন। অফিস ছিল বর্তমান আওয়ামী লীগ অফিসের উল্টো দিকে দোতলায়। একটা টাইপরাইটার ছিল। তিনি বলতেন ভাঙা টাইপরাইটার আর বলতেন 'আমার হানিফ'। বলতেন, আমি বলে গেছি আর আমার হানিফ ওই ভাঙা টাইপরাইটারে সেটা টাইপ করেছে। এটাই ছয় দফার মূল কথা। তবে হ্যাঁ, অন্যরা অনেক ধারণা দিয়েছেন। সেটা বঙ্গবন্ধু ধারণ করেছেন। এভাবে আস্তে আস্তে ছয় দফাকে কেন্দ্র করে ঊনসত্তরের সফল গণঅভ্যুত্থানের পথ রচিত হয়। (চলবে)

লেখক : বঙ্গবন্ধুর একান্ত সচিব

ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর